কুহেলিকা কুয়াশায়

মণিপুষ্পক

৩১শে জুলাই, ২০২২,

(রাত ৯টা, ক্যালিফোর্নিয়া)

আর লড়াইটা চালিয়ে যেতে পারল না, রাতেই চলে গেল তমসা।

খবরটা দু'দিন আগের—

সৌগতের ফোন পেয়ে ঠিক মেনে নিতে পারেনি তন্ময়।

গত পরশু যখন ওর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কলকাতায় কবে যাবে, ঠিক সেই সময় পকেটে রাখা মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে— খবরটা শোনামাত্র তন্ময় দেখল একটা তারা যেন খসে পড়ল পূবের আকাশ থেকে!

সামনের সব ঝাপসা হয়ে আসছিল—

কোথায় যেন হারিয়ে গেল সব,

হারিয়ে যাচ্ছে একে একে... !

আজ কেন যেন পেছনের স্মৃতিগুলো ফিরে ফিরে আসছে। সেই কাকাদাদু, সবুজে সবুজ চারদিকে মাখামাখি, সোনারং ধান খেত, সেই প্রজাপতির পেছনে ছোটা, কুহু, সেই চোখের স্বচ্ছ সলিল হাসি! সেই নিশ্চিন্দিপুর আর সর্বজনীন কাকাদাদুর ঝুলির ট্র্যাজার - অনন্ত অসীম আধার! সে আধার এমনই যে যতই দান করে যাও, অফুরান তার ভান্ডার! বড় আশ্চর্য মানুষ কাকাদাদু! দর্শনে তপস্বী, জ্ঞানে অসীম পারাবার।

বিবেক

(২৮শে মার্চ, ২০০৩, কলকাতা)

'মা আজ আমার ফিরতে একটু রাত হতে পারে' তন্ময়ের কথায় তণিমা খানিকটা অবাক হয়ে গেল। ভাবল ছেলে আজকের কথা কি সব ভুলে গেল নাকি!

'কী রে তুই ভুলে গেছিস আজকের কথা?' মায়ের কথায় তন্ময়ের হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল।

'তাই তো! আজ তুমি বাড়ি থাকতে বলেছিলে। কারা যেন সব আসবে, তাই না মা?'

তন্ময় কথাটা বলতে তণিমা এবার একটু রেগেই উঠলেন।

‘কারা যেন মানেটা কী? হ্যাঁ, কারা জানিস না বুঝি? দেখ তুই চাইলে আমি এখনই দাদাকে বলে ওদের আসতে মানা করে দিচ্ছি।’

‘মা, সরি। তুমি জানত এই ভিসা, পাসপোর্ট এসবের চাপে আমার মাথা থেকে সব বেরিয়ে গেছে। এই শেষ বার মা, আর হবে না! প্লিজ, বলো মা’ তন্ময় মায়ের গলা পেঁচিয়ে ধরল।

‘ছাড় আমায়, বুড়ো বয়সে আর আদেখেলাপনা দেখাতে হবে না। আজকে রঞ্জনাদের বাড়ির লোকজন আসবে।’

‘ও ইয়েস মনে পড়েছে। ঠিক আছে মা, আমি যত তাড়াতাড়ি পারব ফিরে আসব। ওদের বলা হয়ে গেছে। জাস্ট যাবার আগে একটা ছোট্ট গেট-টুগেদার’ বলেই তন্ময় বেড়িয়ে গেল।

আসলে তন্ময়ের অন্য একটা আকর্ষণও ছিল, আর সেটা তো মাকে বলা যায় না।

তমালের সঙ্গে একই কলেজে পড়ায় একজন মেয়ে, যার নাম কুহেলিকা মিত্র। তমালের বাড়িতেই আজকের গেট টুগেদার। ওইখানে ওই মেয়েটির আসবার কথা আছে, আর কারণটা অবশ্যই তন্ময়। ওই নামটা শুনেই তন্ময় তমালকে রিকোয়েস্ট করেছিল ওকে যেন আজ ইনভাইট করা হয়। তন্ময়ের নামটা শুনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়েছিল আর যখন শুনেছিল মেয়েটি ওদের কলেজে ইংরেজিই পড়ায়! দুয়ে দুয়ে চার করতে চেয়েছিল তন্ময়। মাঝে প্রায় আটটা বছর বলতে গেলে দেখাই হয়নি আর লাস্ট দেখা হয়েছিল মাধ্যমিকের পর, একবারই। কিন্তু ম্যান প্রপোজেস অ্যান্ড গড ডিসপোজেস। ওই কুহেলিকা নামের মেয়েটি আসতে পারেনি তমালদের বাড়িতে, কারণ সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই হোস্টেল থেকে আর বেরোতে পারেনি। দুর্ভাগ্য তন্ময়ের। হিসেবটা যেন বড্ড এলোমেলো হয়ে গেল বলে মনে হল তন্ময়ের। এটাও হয়তো প্রিডেস্টাইন্ড।

তণিমা নিজের ঘরে এসেই দাদাকে ফোন করল।

‘হ্যালো দাদা।’

‘হ্যাঁ বল।’

‘তুই একটা কাজ করতে পারবি?’

‘হ্যাঁ বল না, কী করতে হবে।’

‘রঞ্জনার মা, বাবাকে একটু দেরি করে আসতে বলতে পারবি? ধর এই সাতটা নাগাদ। আর সঙ্গে যদি রঞ্জনাও আসে তাহলে খুব ভালো হয়?’

‘সে বলতে পারব। কিন্তু রঞ্জনা আসতে পারবে কিনা বলতে পারব না। কারণ ওর ডিউটি কখন শেষ হবে, সবটা তার ওপর নির্ভর করছে।’

‘আচ্ছা, দেখ যা ভালো বুঝিস। তুই কিন্তু দুপুরে এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি। আমি কোনো অজুহাত, এসব শুনব না’, এই বলে ফোন কেটে দেয় তণিমা।

তণিমা আজ ভাবতে থাকে সেই সব দিনের স্মৃতি ...

তপোব্রত তণিমার থেকে প্রায় বারো বছরের বড়। তণিমা শুনেছে দাদার জন্মের পরেই মায়ের নাকি খুব বড় অসুখ করেছিল! কী সেটা ও জানে না। ডাক্তার বলেছিলেন আর যেন সন্তান না আসে। তবু কী করে যেন ও চলে এসেছিল মায়ের গর্ভে আর জন্ম হয়েছিল সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক ভাবে! আর সকলের চোখের মণি ছিল তণিমা, বিশেষ করে দাদার। ও বলে সেই সময়ই যেমন ছিল দেখতে আর তেমনই ছিল গায়ের রং। সবাই ডল পুতুল বলত।

বাবার চাকরির সূত্রে ওদের বেড়ে ওঠা জলপাইগুড়ি শহরে। যদিও বাবাদের আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ঢাকায়। দেশভাগের আগেই বিতাড়িত হয়ে চলে আসতে হয় এপারে। তখন তণিমা শুনেছে মহম্মদ কবির নামে দাদুর এক প্রাণের বন্ধু, দাদুকে প্রথম আশ্রয় দেয় তার পার্কসার্কাসের বাড়িতে। তখন দাদুর বলতে গেলে দুই সন্তান, এক নিজের ছোট ভাই, বয়স প্রায় আট বছর আর নিজের ছেলে, বয়স এক বছর। তণিমা শুনেছে ঠাকুরদা দুজনকেই মানুষ করেন। পরে তণিমার ঠাকুরদা সেখান থেকে চলে যান নিশ্চিন্দিপুরে। ওখানে একটা স্কুলে চাকরি নেন আর ওখানেই বাসা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। তণিমা প্রায়ই ঠাকুরদার কাছে চলে যেত; কিন্তু তণিমার আকর্ষণ ছিল কাকাদাদু, যিনি ছিলেন নিজের ঠাকুরদার সেই ছোট ভাই। কাকাদাদু তণিমার বাবার থেকে অনেকটাই বড় ছিলেন আর ভীষণ মজার মানুষ ছিলেন। উনি ছিলেন জীবন্ত ডিকশনারি! কী না জানতেন আর ছিল সবাইকে আপন করে নেবার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। সবাই ডাকত কাকাদাদু বলে, তাই তণিমা, এমনকী ওর ছেলে তন্ময়ও ডাকত কাকাদাদু বলে আর সকলের মতো। নিশ্চিন্দিপুরে থাকতেন কাকাদাদু আর থাকত কাকাদাদুর এক দূর সম্পর্কের বিধবা বোন, নাম পারুল, তণিমা পারো পিসি বলে ডাকতো। কাকাদাদু ছিলেন অকৃতদার। গ্রামের মানুষরা যেন সবাই সবার আত্মীয় আর কাকাদাদুকে তো সকলে নিজের দাদুর থেকেও বেশি ভালোবাসত। বাড়িটা সব সময় গমগম করত লোকজনে।

বাবা ছিলেন সরকারি অফিসার, মা গৃহবধূ। তণিমার মাকে মনে পড়ে ঝাপসা। সেই কোন ছোটবেলায় মা চলে গেছে! সবাই বলত ও না কি একদম ওর মায়ের মুখ-চোখ পেয়েছে। কিন্তু তণিমার মনে হত, মা ওর থেকেও অনেক বেশি সুন্দরী ছিল। মা খুবই সুন্দরী ছিল। মা খুব ভালো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারত। ছোটবেলায় তণিমার গানের তালিম নেওয়া শুরু হয় মায়ের কাছেই। তণিমা সেই জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই দেখেছে সারাটা বছর ধরে মায়ের কোনো না কোনো রোগ লেগেই থাকত। মা শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল ছিল। বাবা প্রায়ই মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত। তণিমা তখন খুবই ছোট। ভালো করে বুঝত না। তবে বাবার মুখ দেখে মনে হত যে মায়ের কঠিন কোনো রোগ হয়েছে যার কারণে মাকে নিয়ে বাবার ওত দৌড়ঝাঁপ।

তণিমার মনে আছে, ও মাকে চোখের আড়াল করত না। স্কুল থেকে ফিরেই, মায়ের সঙ্গে থাকত। ও তেমন একটা খেলাধুলা পছন্দ করতো না বলে স্কুলের বাইরে তেমন কোনো বন্ধুও ছিল না। স্কুলেও ও একটু একা একাই থাকতে ভালোবাসত।

মায়ের আদর, ভালোবাসা, তণিমার ভাগ্যে বেশি দিন লিখে রাখেননি ওপরওয়ালা। মেয়েদের জীবনে একটা সময় মায়ের প্রয়োজন খুব বেশি করে দরকার হয়, আর সেটা হল বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে। যদিও বাবা, দাদা, তাদের সবটুকু দিয়ে ওকে ভালোবেসেছে, তবু মনের যে কথা সে সময়ে মেয়েরা মায়ের কাছে বলে, সেই সুযোগটা ওর জীবনে আসেনি। আর ঠিক সেই সময়টাতেই মা চলে গেল তণিমাকে প্রায় নিঃস্ব করে। মা মারা গিয়েছিল তণিমা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখন।

সরকারি স্কুলে দাদা পড়ত আর তণিমা পড়েছে কনভেন্টে। বাবা চাইতেন মেয়ে বড় হয়ে আই.এ.এস হবে। উলটোটা হয়েছিল। তণিমা দর্শনে পিএইচ.ডি করে কলকাতার কলেজে পড়াতে চলে গেল। দাদা তার অনেক আগেই চলে গিয়েছিল দিল্লি, আই. আর. এ. এস হয়ে। বাবা জলপাইগুড়িতেই ছিলেন।

তণিমা চাকরি নিয়ে চলে আসে কলকাতার কলেজে। প্রথমটা তণিমার বাবা আপত্তি করলেও পরে মেনে নেন। আসলে মেয়েকে একা ছাড়তে চাননি কান্তিময় গুহ। কেবল মনে হত যে মেয়ের যদি কোনো বিপদ হয়! আসলে মা চলে যাবার পর থেকে বাবা তণিমার প্রতি আরও বেশি করে খেয়াল রাখতে শুরু করেছিল। সব সময় একটা ভয় যেন ঘিরে থাকত বাবাকে, এই বুঝি মেয়ের কিছু হল, সঙ্গে দাদাও। কিন্তু পরে ভেবে দেখেছেন একদিন না একদিন তো মেয়েকে ছাড়তেই হবে, তাই আর বাধা দেননি।

এখানেই তণিমার সঙ্গে কলেজে আলাপ শেখরের, শেখর গুপ্ত, ইংরেজির অধ্যাপক। তণিমার জীবনে ওই প্রথম কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে আসা।

তণিমাদের কলেজের স্টাফ রুমটা বেশ বড়। প্রথম দিন প্রিন্সিপ্যাল সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুদিনের ভেতর বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তণিমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জয়েন করার তৃতীয় দিনে দুটো ক্লাস নিয়ে তণিমা সবে এসে বসেছিল লাইব্রেরিতে। হঠাৎ তখন সেখানে এক ভদ্রলোক এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন,

'আমি শেখর গুপ্ত। ইংরেজি পড়াই। আসলে আমি কয়েকদিন ছুটিতে ছিলাম, আর আজ এসেই শুনলাম আপনি নতুন জয়েন করেছেন, তাই ভাবলাম এই ফাঁকে আলাপটা সেরে ফেলি।'

প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সুদর্শন। মুখে ট্রিম করা দাঁড়ি। প্রথম দর্শনেই বেশ ভালো লেগে যায় তণিমার।

'নমস্কার' তণিমা হাতজোড় করে প্রত্যুত্তর দেয়।

'আপনি কি গান করেন?'

'কেন বলুন তো?'

'না গলা শুনে মনে হল।'

'বাহ আপনার উপলব্ধির সত্যি প্রশংসা করতে হয়?'

'কেন ভুল কিছু বললাম?'

'খুব একটা কিছু ভুল বলেননি।'

তারপরে একটু একটু করে আলাপটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল কলেজের বাইরে আরও ঘনিষ্ঠতার দিকে। তণিমা যেন একটু বেশিই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল শেখরের প্রতি। সেটা কি যৌবনের ধর্ম! অন্তরে কি সুপ্ত বাসনা ফল্গুধারার মতো বয়েছিল এতদিন!

বন্ধুত্ব নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি। তারপর থেকে ক্লাসের পর পিজিতে পৌঁছে দেওয়া, ছুটির দিনে সিনেমা দেখা, এসব বেশ কিছুদিন চলেছিল বিয়ের আগে পর্যন্ত। তণিমা শেখরের সাহিত্যের পরিধির ওপর অগাধ বিচরণ আর ভাষার দখল দেখে বিস্মিত হয়েছিল! কখন 'আপনি' সম্বোধন 'তুমিতে' নেমে এসেছিল আজ আর মনে নেই।

'দেখো শেখর তোমার উচিত পোস্ট ডকের জন্য বিদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করা।' তণিমা বলেছিল।

'কেন, এখানে কি তোমার আমায় দেখতে ভালো লাগছে না?' বলেই হাসতে শুরু করেছিল শেখর।

'ধূর, কী যে বলো।'

'না তণিমা এবার চলো একটা কিছু করে ফেলি।'

'কী করবে?'

'কেন? বিয়ে!'

'তোমার মা রাজি হবেন?'

'কেন হবেন না, মা সব জানে।'

'ওকে। বাবাকে এবার ছুটিতে গিয়ে বলব।'

এরপর দুই বাড়ির কথায় বিয়েটা সারা হয়ে গিয়েছিল, যদিও দাদার একটু আপত্তি ছিল। কিন্তু তণিমা সে সময় বোঝেনি কেন দাদার আপত্তি ছিল। তাই একটু রাগও হয়েছিল দাদার ওপর সেই মুহূর্তে।

শেখরদের নির্ঝঞ্ঝাট সংসার ছিল, মা আর ছেলে। প্রথমটা বোঝা যায়নি, পরে তণিমা বুঝেছিল যে শাশুড়ি একজন অত্যন্ত দজ্জাল মহিলা আর সেকেলে মানুষ। তণিমার কাজ করাটা মেনে নিতে পারেননি। কলেজ থেকে ফিরলেই মানসিক নির্যাতন শুরু করতেন। প্রায় প্রতিদিন কিছু না কিছু নিয়ে লেগে থাকত।

'আমি আর এভাবে প্রতিদিন মানসিক যন্ত্রণা নিতে পারছি না—' তণিমা যেদিন আর না পেরে শেখরকে বলল, সেদিন শেখর তার আসল রূপ প্রকাশ্যে নিয়ে এল।

'কেন না পারার তো কিছু নেই।' নির্লিপ্ত উত্তর শেখরের।